Website: https://www.parthasarathipatrika.com

:: ২০তম অন্তর্জাল সংখ্যা::

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ / 24.11.2021

-: সম্পাদক :-

সুনন্দা ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

শ্রীঅরবিন্দের গীতাভাষ্য	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
মহানির্বাণ	ডঃ প্রভাত সান্যাল
পরম সাধক শ্রীরামঠাকুর	শ্রী অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ
মামনুসর	সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by
Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website : https://www.parthasarathipatrika.com
Contact : 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

(10.03.1926 - 24.11.1986)

শ্রীঅরবিন্দের গীতাভাষ্য

শ্রী প্রীতি কুমার ঘোষ

অজ্ঞানের অন্ধকারে সমগ্র জগত আজ আচ্ছন্ন। আসুরিক শক্তির মানুষ আজ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। হিংসা, দ্বেষ, বাসনা, কামনা তার দেহে বাসা বাধিয়াছে। দেবজন্মে রূপান্তরিত হওয়াই মনুষ্য জন্মের বিবর্তন। সেই দেবত্বে পৌঁছিবার ক্ষমতা সমস্ত মানুষের আছে কিন্তু মানুষ সেই দেবত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক প্রতি নিয়ত বাসনা কামনার পঙ্কিল আবর্তে পতিত হইতেছে। মানুষের সত্তার অন্তরে যে ব্রহ্মজ্ঞান লুকায়িত রহিয়াছে সে তাহার সন্ধান পাইতেছে না। অহং এর বশে কর্ম করিতেছে, পাপ পুণ্য নিজেদের বলিয়া ভ্রম করিতেছে, নিজেরা যে এক মহত্তর শক্তির যন্ত্র তাহা উপলব্ধি না করিয়া নিজেদের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেছে, যিনি নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম তিনি পাপ পুণ্যের বোধ গ্রহণ করেন না। অজ্ঞানে বিমূঢ় মানুষ আত্মার সে মুক্তভাব উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না।

গীতা বেদান্তের প্রামান্য গ্রন্থ। ইহা সর্ব শাস্ত্রের সার। এক যুগ সন্ধিক্ষণে ভগবান গীতার শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন, আজও পৃথিবীর এই পুঞ্জীভূত অন্ধকার অপসারিত করিতে মানুষকে বাসনা কামনার পঙ্কিল আবর্ত হইতে উদ্ধার করিয়া অমৃতত্বের দিকে লইয়া যাইবার সময় আসিয়াছে। গীতার শিক্ষাকে সঠিক গ্রহণ

DO NOT COPY

করিতে পারিলে, গীতার শাশ্বত সত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে মানুষ দিব্য চেতনা লাভ করিবে। মানবাত্মা দেবাত্মায় রূপান্তরিত হইবে।

আজকাল অনেকে সাড়ম্বরে যাগযজ্ঞের দ্বারা গীতার প্রতি তাঁহাদের ভক্তি প্রকাশ করেন। তাঁহারা গীতার আসল সত্য বুঝিতে পারেন না। পূর্বেই বলিয়াছি গীতা সর্ব শাস্ত্রের সার। ইহা মৃত্যুপথযাত্রী জাতির হৃদয়ে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে পারে। কিন্তু মানুষ গীতাকে সঠিক অর্থে গ্রহণ না করিয়া ধর্মকে একটা কার্য ক্রিয়া কলাপের ব্যপার করিয়া তুলিয়াছে। অধ্যাত্ম স্রোত ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর রূপ ধারণ করিতেছে। তাই আজ সমাজে এত দুর্নীতি, এত দুর্দশা। কেবলমাত্র গীতার বহুল প্রচারের দ্বারাই এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

শ্রী অরবিন্দ গীতার সত্যকে সঠিক ভাবে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে "Essays on the Gita" নামে একখানি অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে তিনি চুলচেরা বিচার আর পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করিয়া গীতার শিক্ষাকে সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রী অরবিন্দের এই গীতা ভাষ্য পাঠ করিলে ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা দূর হইবে। মানুষের সহজ বোধ শক্তির সাহায্যে ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞান লাভ করিবে; আপন সত্বার অন্তরে লুক্কায়িত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে। মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যের ন্যায় সমস্তই তাহার নিকট প্রকটিত হইবে।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম।। ৫/১৬

শ্রীঅরবিন্দ শ্রীভগবান কর্তৃক সনাতন ধর্ম রক্ষাকল্পে গীতার সঠিক ভাষ্য রচনার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কারাবাসের পর তিনি তাঁহার বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, "যে বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি তোমার ছিল না, আমি তোমার হয়ে তা ছিন্ন করে দিয়েছি কারণ এটা আমার ইচ্ছা নয় এবং কখনও আমার অভিপ্রায় ছিল না যে, তুমি এই কাজ নিয়ে থাকবে। তোমার জন্যে আমি অন্য কাজ ঠিক করে রেখেছি এবং তার জন্যই তোমাকে এখানে এনেছি, তুমি নিজে যা শিখতে পারনি তাই তোমাকে শিখিয়ে দিতে

এবং তোমাকে আমার কাজের জন্য তৈরী করে তুলতে। তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে হয়নি, পরন্তু অনুভূতি উপলব্ধির ভিতর নিয়ে জানতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছ থেকে কি চেয়েছিলেন, যারা তাঁর কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের কাছ থেকে তিনি কি চান – রাগ দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর জন্য কর্ম করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে, ভগবানের হাতে নির্ব্বিরোধ বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে, অথচ তাঁর কাজে শৈথিল্য করা চলবে না। আমি অনুভব করলাম, হিন্দু ধর্মের প্রকৃত মর্ম কি। আমরা অনেক সময়েই হিন্দু ধর্মের কথা, সনাতন ধর্মের কথা বলি, কিন্তু সে ধর্ম যে কি বস্তু তা আমাদের মধ্যে কজন জানে? অন্যান্য ধর্মের প্রধান কথা হচ্ছে বিশ্বাস ও মতবাদ। কিন্তু সনাতন ধর্ম হচ্ছে জীবনই; এটি এমন জিনিষ যা শুধুই বিশ্বাস করবার নয়, পরন্তু জীবনে ফুটিয়ে তোলবার। মানব জাতির মুক্তির জন্যে এই ধর্মকেই পুরাকাল থেকে এই উপদ্বীপের নিঃসঙ্গতায় পোষণ করা হয়েছে। এ ধর্ম দেবার জন্যই ভারত উঠছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় সে নিজের জন্য উঠছে না অথবা যখন সে শক্তিমান হবে তখন দুর্বলকে পদদলিত করবার জন্যও সে উঠছে না। যে সনাতন জ্যোতি তাকে দেওয়া হয়েছে জগত মাঝে তাই বিকীরণ করবার জন্য সে উঠছে। ভারত চিরদিনই মানব জাতির জন্য জীবন যাপন করেছে, নিজের জন্য নয়, আর তাকে যে বড় হতে হবে তাও তার নিজের জন্য নয়, মানব জাতির জন্য।–” তাই মানুষের জীবনের সমস্যা বাঁচিয়া থাকিবার সমস্যা। এই অজ্ঞানতা এই দুঃখ, এই অশান্তি হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে বাসুদেব আদিষ্ট শ্রীঅরবিন্দের গীতা ভাষ্যের সাহায্যে গীতা শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই জীবন শান্তি জ্যোতি ও আনন্দে পূর্ণ হইবে।

DO NOT COPY

(15.10.1936 - 24.10.2019)

পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার

শুক্লা ঘোষ

বহুদিন পর আবার শ্রীপ্রীতিকুমারের পত্রাবলীর কিছু অংশ প্রকাশিত হচ্ছে। এই চিঠিগুলি তিনি লিখেছিলেন যখন আমি পর্বতারোহনের জন্য মানালীতে গেছিলাম। দীর্ঘ একমাস প্রায় আমি বাড়ি ছিলাম না। প্রকৃতির প্রতি অত্যধিক আকর্ষণে আমি হিমালয়ে চলে যেতাম। উত্তর ভারতের প্রায় সব কয়টি hill station এই আমি গিয়েছি। তার মধ্যে মানালীর প্রতি আমি ভীষণ আকর্ষণ বোধ করি। বছরে দু-একবার ছুটি পেলেই আমার মানালী ঘোরা হয়ে যেত। আমার এ পর্যন্ত শেষ যাওয়া ১৯৮৬ সালের আগষ্ট মাসে, রুবালকাং অভিযানে। ভারতীয় কেন বিশ্বের পর্বতারোহণের ইতিহাসেও একই পরিবার থেকে ঠাকুমা, বাবা ও মেয়ে তিন প্রজন্মের একত্র উপস্থিতি আছে কিনা জানা নেই। শ্রীপ্রীতিকুমারের আশীর্বাদে আমাদের সে অভিযান সফল হলেও তাঁর অনুপস্থিতির জন্য ১৯৮৬-র পর দীর্ঘদিন আমাদের হিমালয়ে যাওয়া হয়নি।

আমাকে শ্রীপ্রীতিকুমার শিখিয়েছিলেন এগিয়ে যেতে। হিমালয়ের প্রতি আমার এত আসক্তি জন্মাত না যদি তাঁর উদারতা অনুপ্রেরণা না থাকত। কত শ্রম, কত ব্যয় – আমার কখনো কিছু অসুবিধা হয়নি। আমি একটি সাধারণ মেয়ে – আমি যদি সময়মতো প্রেরণা বা অর্থ না পেতাম আমার পক্ষে পর্বতারোহণ করা সম্ভব হতো না। আমিও চেষ্টা করেছি বাংলাদেশের সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের এ পথে উৎসাহিত করতে। কোথাও পেরেছি, কোথাও

DO NOT COPY

পারিনি। আমার ছেলেটিও পর্বতারোহণে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাই আমার বিশ্বাস আমি চলে গেলেও পর্বতারোহণের বীজ প্রোথিত থাকবে।

শ্রীপ্রীতিকুমার আমার পর্বতারোহণে উৎসাহ দেবার জন্য প্রায় প্রতিদিনই চিঠি লিখতেন। তখন ডাক ব্যবস্থা এখনকার মত ধীর গতিতে চলত না। Express Delivery করলে চিঠি পাওয়া যেতোই। তখনকার দিনের ক'টি চিঠি এখানে তুলে ধরলাম।

13.06.66
সোমবার, সকাল ১১টা

অভিন্নহৃদয়েষু,

আমাদের চিঠি কেন পাচ্ছনা বুঝলাম না। আমরা নিয়মিত চিঠি দিয়ে চলেছি। গতকাল বাবুকে নীরেন নিয়ে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। অনু ও বাবু কাল ওখানে সিনেমা দেখেছে। সন্ধ্যায় বাড়ি এসেছে। গতকাল রবিবার 'সেবা'র বিয়ে ছিল। আমি যাইনি। বাবু গেছিল। বাবুর হাতে একটি শাড়ি পাঠিয়েছিলাম। বৃহস্পতিবার থেকে বাড়িতে মিস্ত্রী লাগাব ঠিক করেছি। রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর ঠিক করবে।

বাবুর আজ থেকে স্কুল খুললো। তোমার Express চিঠিও কাল পেয়েছি। তোমার শরীর কেমন থাকে জানাবে। ভাবনা চিন্তা কোর না। মনে সাহস রাখবে। খুব ভালভাবে উত্তীর্ণ হতে পারবে। দেখবে সকলেই তোমার প্রশংসা করবে। ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি খুলে রাখ, দেখবে বেদনা ও কষ্ট অনেক লাঘব হবে।

আমার আদর জেনো।

ইতি– তোমার প্রীতিকুমার

15.06.66

অভিন্নহৃদয়েষু,

মহারাজ সময় করে উঠতে পারছেন না তোমাকে চিঠি দেবার। তাছাড়া স্কুলও খুলেছে। আবার শঙ্করদাও দিন কয়েক আসছেন না। এ ছাড়া সংসার সম্বন্ধে একটু নির্লিপ্ত ভাব তো আছেই। আমাদের দিন চলেছে। কলকাতায় আজ দুদিন একটু বৃষ্টি পড়েছে। আজ ১৫ তারিখ। তোমার কাজ অনেকদূর

DO NOT COPY

এগিয়ে গেছে নিশ্চয়ই। আর নিশ্চয়ই কোন ভয় ভাবনা নেই। যা কিছু করবে ধীর স্থির ভাবে করবে। নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চল।
আদর জেনো। ইতি–

প্রীতিকুমার

17.06.66

অভিন্নহৃদয়েষু,

আজ হয়ত তুমি পর্বতের উচ্চ শিখরে উঠেছ। সে স্থান সাধারণের নাগালের বাইরে। জীবনে প্রতি ধাপে ধাপে এমনি ভাবেই সর্বত্র উচ্চ শিখরে উঠে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা আনতে হবে। ঐকান্তিকতা ও আকাঙ্ক্ষা থাকলে সবই হয়। শুধু এগিয়ে যাবার দৃঢ় সঙ্কল্প রাখতে হবে সমস্ত বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ করে। মনে জোর ও সাহস রাখতে হবে। বাবু ভালো আছে। আমাদের দিন চলেছে। শুধু ২৮ তারিখে তোমার আসবার দিন গুনছি। বাবু স্কুলে যাচ্ছে। আমার আদর নিও।

ইতি– প্রীতিকুমার

17.06.66

অভিন্নহৃদয়েষু,

জয় তোমার হবেই। কোনও ভাবনা শরীরের যাতনা নয়। মন ও প্রাণকে আপন কর্মে কেন্দ্রীভূত করো। লক্ষ্য রাখ ঈশ্বরে। ১৩ ও ১৪ তারিখে সোম ও মঙ্গলবার সারারাত ঘুমাতে পারিনি। কেবলই তোমার কথা তোমার চেহারা মনে হচ্ছিল। এত ছটফট জীবনে কখনো করিনি। মনে হচ্ছিলো তুমি কাছে পাবার জন্য ডাকছ। বোধহয় তোমার খুবই কষ্ট হচ্ছিলো। যতই রাত বেশি হয় ততই ঐ কষ্ট বেশী অনুভব করি। ঐ দুদিন সারাক্ষণ বাবুও জিজ্ঞাসা করছিলো তুমি কবে আসবে। ওর কষ্ট দেখে নিজেকে ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি।

যাক, তোমার বাড়ীর অনেক পরিবর্তন করে ফেলেছি। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর সব ঠিক করে ফেলেছি। এসে দেখবে অনেক কিছু বদল হয়ে গেছে।
আদর নিও। ইতি–

তোমার প্রীতিকুমার

DO NOT COPY

20.06.66

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার উপরে ওঠার চিঠি পেলাম। তোমার কষ্ট ও আমাদের কষ্ট এক হয়ে মিশে গেছে। আমাদের যথেষ্ট উপলব্ধি হয়েছে। শুধু তোমার আসার দিন গুণে চলেছি। শূন্যতা যেন ক্রমেই ঘিরে ধরছে।

বাড়ীর কাজ অনেক এগিয়েছে। এলেই অনেক নিশ্চিন্ত বোধ করবে। যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে দোতলার কাজ আরম্ভ করব। কলকাতা থেকে অন্য মিস্ত্রী এনে কাজ করাচ্ছি।

আর চিঠি দেব না। আজ ২০/৬ তারিখ। এরপর চিঠি দিলে তুমি পাবে না। যদি তোমার আসবার দিন ঠিক করে টেলিগ্রাম করতে পার, ভালো হয়। না পারলে অসুবিধা নেই। ২৮ এবং ২৯, দুদিনই ষ্টেশনে থাকবো। বাপী স্কুলে। আমি কয়দিন বাড়িতেই আছি। আজ রথ। মহারাজ স্কুল থেকে এসে রথ চালাবেন। সব ব্যবস্থা হচ্ছে। মহারাজের ওয়াটারপ্রুফ কেনা হয়েছে।

আদর জেনো।

ইতি– তোমার

প্রীতিকুমার

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(** রচনা কালঃ নভেম্বর, ১৯৮৮)

"নিয়মিতভাবে যে মন্ত্র জপ করবে তার পক্ষে সেটা ভিতর থেকে আপনা হতে আবৃত্তি হতে থাকবে, তার মানে আভ্যন্তরীণ সত্তাতে সে মন্ত্র চলে গেছে। এর ফল অনেক ভাল হয়।"

-শ্রীঅরবিন্দ

DO NOT COPY

মহানির্বাণ **ডঃ প্রভাত সান্যাল**

১৯৫০ সালের ২৯শে নভেম্বরের এক সন্ধ্যা – সমস্ত দিনের কর্মভার অবসানের পর বিশ্রাম করছি। আমার আরদালী এসে আমার হাতে একটি টেলিগ্রাম দিল। তাতে লেখা – "বিমানে চলে এস – জরুরী–মা"। ঐ সংক্ষিপ্ত শব্দ কয়টি কি অর্থ বহন করছিল কোন মতেই আমি তা আন্দাজ করতে পারিনি।

হঠাৎ আমার মনে তখনই বিদ্যুৎ খেলে গেল, শ্রীঅরবিন্দ কি অসুস্থ? তা না হলে শ্রীমা কেন আমাকে এইরকম টেলিগ্রাম পাঠাবেন? অন্য ভাবনাও মনে এসেছিল কিন্তু আমি স্থির করতে পারলাম না এই কাজে আমি নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারি কিভাবে?

পরদিন ৩০শে নভেম্বর প্রাতঃকাল। আকাশপথে মাদ্রাজে এসে পৌঁছলাম। পৌঁছলাম বটে কিন্তু খবর নিয়ে জানলাম পণ্ডিচেরী যাবার ট্রেন সেই ৯টা ৫০ মিনিটে। তার অর্থ পরদিন সকাল ৭টার পূর্বে আমি পণ্ডিচেরী পৌঁছতে পারব না। এক হাজার মাইল পাঁচ ঘন্টায় উড়ে এসে একশ' মাইল যেতে আমার কুড়ি ঘন্টা লাগবে ভাবতে মনে এক দংশন অনুভব করলাম। টেলিগ্রাম পড়লাম আর–একবার, না, আমি সময় নষ্ট করতে পারব না, সুতরাং তৎক্ষণাৎ একটি মোটর গাড়ী ভাড়া করে ফেললাম। পুলিশের অনুমতি আদায় করতে লেগেছিল একটি ঘন্টা। আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করে তারা বুঝবার চেষ্টা করছিল আমি কোন চোরাকারবারী কিনা অথবা পাঁড় মাতাল ফরাসী ভারতে স্ফূর্তি করতে বেরিয়েছি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমাকে তারা ছেড়ে দেওয়াই সাব্যস্ত করেছিল। মোটর চালক তার অতিরিক্ত পাওনা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েই –সাদা কথায় বলা যায় – কেবলমাত্র বার দুই অপটু এবং হটমেজাজী শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের হাতে তার গতি ব্যাহত হবার পর পণ্ডিচেরীর পথ বেয়ে যেন উড়ে চলে এসে একেবারে পৌঁছে দিল আমাকে আশ্রমের "প্লে গ্রাউন্ডে"। শ্রী মায়ের চরণে এসে যখন পড়লাম তখন সন্ধ্যা ছয়টা। শ্রীমা তাঁর চিরন্তন সেই দিব্য হাসি ছড়িয়ে আমাকে আহ্বান করে বললেন, ঐ সন্ধ্যাতেই তিনি আমার আগমন প্রত্যাশা করছিলেন। পরক্ষণে শ্রীঅরবিন্দের পীড়ার বিবরণ দিয়ে বললেন তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে। আর জানালেন খেলার মাঠের কর্মসূচী শেষ করেই তিনি যাবেন তাঁর কাছে।

পথে আশ্রমের ডাঃ নীরদ এবং আমার নবীন সহযোগী ডাঃ সত্য সেন গুরুদেবের পীড়ার বিবরণ দিয়ে তাঁর বর্তমান অবস্থা আমাকে জ্ঞাপন করলেন। শান্ত অথচ দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে প্রবেশ করলাম শ্রীঅরবিন্দের ঘরে। স্থিরভাবে রইলাম তাকিয়ে গুরুদেবের দিকে – আমার স্বর্গলোকের রোগী বিছানার উপর অর্ধ-শায়িত প্রচ্ছন্ন এক উদাসীন মূর্তি ধরে। নেত্রযুগল মুদ্রিত – সে যেন মহান এক স্তব্ধ শান্তির মর্মর মূর্তি।

আমি বিছানার কাছে এগিয়ে জানু পেতে বসে তাঁর পায়ে প্রণাম নিবেদন করলাম। চম্পকলাল তাঁকে খুব মৃদুকন্ঠে ডাক দিয়ে বললেন, "তাকিয়ে দেখুন গুরুদেব, কে এসেছেন।" শ্রীঅরবিন্দের মুখখানা নড়ে উঠল। ভারী চক্ষুপল্লব উন্মীলিত হল একটুখানি – পরক্ষণেই আবার স্থির, শান্ত। কিন্তু চম্পকলাল আবার ডাকলেন, গুরুদেব, দেখুন ডাঃ সান্যাল এসেছেন।" এইবার তিনি তাকালেন পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে। তাঁর হাসি সমস্ত মুখের উপর পড়ল ছড়িয়ে, আহা! সে কি অপূর্ব হাসি, প্রশান্ত সৌন্দর্য-মণ্ডিত – সেই দিব্য হাসি, যে কোন মানুষকে উত্তরণ করাতে পারে আনন্দ সাগরে, অন্তরের নিভৃত কন্দর আলোকিত করে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর হাতখানি আমার মাথায় রাখলেন, আমার সর্বাঙ্গে তাঁর স্নেহের স্পর্শ লাগল। মুহূর্তে সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে আমার কলরব মুখর হৃদয় যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। আমার চিত্ত সংহত হল এক সুমহান শান্তি এবং স্থৈর্যে। শ্রীঅরবিন্দের চক্ষু মুদ্রিত – নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঞ্চালন ছাড়া সবই স্থির – সে এক যেন বিশাল প্রমূর্ত নীরবতা। চম্পকলালের খুশী ভাব তখন আর ধরে না, চুপিচুপি আমাকে বললেন, "দর্শন, হাসি, আশীর্বাদ, গুরুদেব তোমাকেই প্রদান করলেন।" এই আশীর্বাদ এমন যে কোন ভাষাই তাকে বর্ণনা করতে পারে না। যে দেখেছে এবং জেনেছে হৃদয় দিয়ে কেবল সেই তা উপলব্ধি করতে পারে, কারণ এ যে আত্মার অভিজ্ঞতা।

আমি ডাক্তারী বিদ্যা প্রয়োগের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি তাঁর অসুবিধা এবং কোন উপশম করতে পারি কিনা আমি। আমার রোগী যে মরদেহে স্বয়ং ভগবান, সাময়িকভাবে তা ভুলে গিয়ে আমি তাঁকে পেশাদারী ডাক্তারী প্রশ্ন করতে থাকি। তিনি উত্তর দিলেন সংহত

কণ্ঠেঃ "কষ্ট? আমার কোন কষ্ট নেই। আর দুর্ভোগ? তা অতিক্রম করা যায়।" আমি মূত্র সম্পর্কিত অবরোধের উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, "হ্যাঁ তাই – কিছু অসুবিধা হয়েছিল কিন্তু তা চলে গিয়েছে – এখন কিছু টের পাচ্ছি না।" পুনর্বার নীরবতায় নিমজ্জন।

পাশের ঘরে এসে আমি নীরদ ও সত্যর সঙ্গে পরামর্শ করি। প্রস্রাবের রিপোর্টে শ্বেত পদার্থ এবং শর্করার ভাগ (Albumin and Sugar) অল্প বলেই উল্লেখ ছিল। Sp.gr যা থাকা উচিত তার একটু উপরে। শ্রীমা এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের ঘরে প্রবেশ করে বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে শ্রীঅরবিন্দকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। একটু পরে তিনি আমাকে ডেকে পাশের আর একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি শ্রীঅরবিন্দের অবস্থা বুঝিয়ে বললাম যে তাঁর মূত্রগ্রন্থি সামান্য দূষিত হওয়ার দরুন তিনি ভুগছেন। তবে রিপোর্ট বিচার করলে সে রকম সাংঘাতিক কিছু নয়।

আমাদের সকলের মনে এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা – ভগবানের ইচ্ছায়, মূত্রপ্রবাহ যদি অব্যাহত থাকে তা হলেই যথেষ্ট, কারণ antibiotics বাকি উপসর্গগুলিকে আরোগ্যের দিকে এগিয়ে দেবে।

পরদিন প্রাতঃকাল – ১লা ডিসেম্বর। দিনটি আমাদের কাছে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে দেখা দিল; আমাদের গুরুদেব সম্পূর্ণ সচেতন, সাড়া দিচ্ছেন এবং তাঁর শরীরের তাপ স্বাভাবিক। গরম জল দিয়ে তাঁকে মুছিয়ে দেবার পর তিনি তাঁর প্রাত্যহিক প্রাতঃরাশ গ্রহণ করলেন, এমন কি আমাদের সঙ্গে হাস্যপরিহাসও বাদ গেল না। আমি তাঁর মস্তকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি ওতে আরাম পাচ্ছেন কিনা।

তিনি বললেন, "আমি জানতাম তুমি ডাক্তারী বিদ্যা বৃত্তির জন্য বিলাত গিয়েছিলে – কিন্তু কোথা থেকে তুমি Massaging বিদ্যা শিখলে?"

তাঁর রক্ত নিয়ে আমরা বিস্তারিত ডাক্তারী পরীক্ষা করতে চাই তাঁকে এ কথা জানাতেই তিনি হেসে তির্যক সুরে বললেন, "তোমরা কেবল ব্যাধি আর ওষুধের কথাই চিন্তা কর কিন্তু তাদের বাইরে এবং উপরে রয়েছে প্রচুর ফলপ্রসূ বিদ্যা। আমার কিছুই প্রয়োজন নেই।"

তাঁর এই অভাবনীয় উন্নতিতে আমাদের সকলের মনে আনন্দের সীমা নেই! এই ভাবে সেই দিনটি কেটে গেল।

DO NOT COPY

পরদিন ২রা ডিসেম্বর। অপরাহ্নের দিকে দেহের তাপ বেশী হল এক ডিগ্রী, অন্য কোন পরিবর্তনও খুব কম। প্লে গ্রাউন্ডে বার্ষিক ক্রীড়া প্রদর্শনীর দ্বিতীয় দিন, শ্রীমা অত্যন্ত ব্যস্ত, খেলা সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ক্রীড়া প্রাঙ্গন ছেড়ে একেবারে গুরুদেবের ঘরে এসে উপস্থিত। দাঁড়ালেন তাঁর শয্যার পাশে, মুখ গম্ভীর, একটি কথা নেই। আমি বললাম মাকে, নির্গমন অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও যখন মূত্রাশয়ের বিষক্রিয়া বেড়েই চলেছে তখন আমরা তাঁর দেহে রোগ বিনাশক জীবাণুর অনুপ্রবেশ করান (Antibiotics and Influsion Therapy) বিবেচনা করতে পারি। শ্রীমা আমাকে সাবধান করে দিলেন, বললেন, শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে প্রাচীন গতানুগতিক চিকিৎসা পদ্ধতি উপযুক্ত নয় – তিনি তা পছন্দই করবেন না এবং জিনিষটি অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে তাঁর পক্ষে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন আমাকে যে আমার রোগী স্বয়ং ভগবান। যা তাঁর দরকার তিনি নিজেই করে নেবেন। আমি তো কেবল বাইরের লক্ষণ দেখে তাদের উপশমের জন্য গতানুগতিক চিকিৎসাই করতে পারি।

আমরা ডাক্তারবৃন্দ হতভম্ব হয়ে পড়লাম। সত্যি তো, আমাদের রোগী যে অবতার। তিনি আশ্রমে সাধকদের অনেক ব্যাধি নিরাময় করেছেন এবং অনেক সময়ে নিজেরও। এবার কি তবে তিনি নিজেকে রোগমুক্ত করবেন না? মনে জেগে উঠল এই প্রশ্ন।

কোন এক সুযোগে অনুনয় করে জিজ্ঞাসা করলেন চম্পকলাল, "প্রভু কেন আপনি আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন না, কেন নিজেকে রোগমুক্ত করছেন না?" প্রত্যুত্তরে তিনি স্তব্ধ হয়ে রইলেন। মনে হল ঐ প্রশ্নে তিনি বিরক্ত।

৩রা ডিসেম্বর – অপেক্ষাকৃত নীরব ও শান্তিপূর্ণ ভাবে অতিবাহিত হল রাত্রি। সকালে তাঁকে দেখে মনে হল তিনি আজ সুস্থ। প্রাতঃকালীন ক্রিয়াদির পর নীরদ ধরলেন ফলের রস তাঁর মুখের কাছে–সে রস পান করলেন শ্রীঅরবিন্দ। মনে হল তিনি তৃপ্ত হয়েছেন।

তাঁর শরীরের তাপ স্বাভাবিকে পরিণত, এবং আমাদের স্বস্তি এতখানি ফিরে এল যে ১১টার সময়ে শ্রীমাকে প্রণাম করে এই প্রস্তাব করতে সাহস হল – গুরুদেবের অবস্থার যখন নিশ্চিত উন্নতি হয়েছে তখন সেই সন্ধ্যায়ই আমি কলকাতায় ফিরে যেতে পারি। শুনেই শ্রীমা নীরব – মুখ গম্ভীর। তাঁর তখনকার সেই চোখের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল আমার অন্তর। একটা বেদনার অনুভূতি

তীব্র হল। আমি চলে যাই একি তাঁর ইচ্ছা নয়? তাঁর পক্ষ থেকে প্রত্যাবর্তনের আদেশের অপেক্ষা না করে কেন আমি নিজে থেকেই প্রস্তাব করলাম চলে যাবার? মনের ভিতরে কেবলই মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল, কেন? কেন? গভীর ভারাক্রান্ত কন্ঠে বললাম তখনই, "মা, আমি না হয় আর ক'দিন থেকেই যাব।" শ্রীমায়ের গম্ভীর মুখখানি দীপ্ত হয়ে উঠল হাসিতে। তিনি সম্মতি দিলেন।

বিকেলে দ্রুত পট পরিবর্তন, দেহের তাপ বেড়েছে ১০১ ডিগ্রীতে। শ্বাস-প্রশ্বাসের রীতিমত কষ্ট দেখা দিল। ৪টার সময়ে শ্রীমা ঘরে প্রবেশ করে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন সব। সমস্ত অপরাহ্ন ভরে তাঁকে জল অথবা ফলের রস খাওয়াবার জন্য আমাদের বেগ পেতে হচ্ছিল রীতিমত, আমরা শরণাপন্ন হলাম শ্রী মায়ের। শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের মুখের কাছে ধরলেন চামচটি। সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব তাকালেন দীর্ঘায়িত দৃষ্টি মেলে, কয়েক চুমুক গ্রহণ করেই আবার ডুবে গেলেন নীরবতায়।

শ্রীমা আমাদের সকলকে নিয়ে এলেন পাশের ঘরে এবং আমাদের কাছে এই প্রথমবার ঘোষণা করলেন, "ভিতরে ভিতরে শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ সজ্ঞান কিন্তু নিজের সম্বন্ধে ভাবনা শিথিল করে দিয়েছেন।" আমরা তাঁর কথার অর্থ সামান্যই ধরতে পারলাম। তাঁকে প্রশ্ন করতে সাহস হল না আর।

আশু ফলপ্রদ কোন চিকিৎসার আয়োজন করা যাচ্ছে না দেখে সত্য চঞ্চল হয়ে উঠল। শ্রীমা শুধু বললেন, সমস্তই নির্ভর করছে শ্রীঅরবিন্দের উপর।

দিন নিভে গেল। বাইরের অন্ধকার আবৃত করল আমাদের। হৃদয়ও ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠল আঁধার ভারাতুর। কখনও নীরদ কখনও চম্পকলাল শ্রীঅরবিন্দের মুখের কাছে ধরতে লাগলেন পানীয়। তিনি নিজেও চেয়ে নিতে লাগলেন তাঁর ইচ্ছামত টমেটো কি কমলালেবুর রস বা অন্য কোন পানীয়। তারপর মুহূর্তেই আবার স্তব্ধ, সমাহিত, এমনই চলতে লাগল।

কোন সময়েই তিনি বলতেন না বা বুঝতে দিতেন না যে তিনি অসুবিধা বোধ করছেন অথবা তৃষ্ণার্ত। কিন্তু যদি আমরা তাঁর পাশ বদলে দিতাম অথবা যদি মুখের কাছে ধরতাম পানীয় তিনি তা গ্রহণ করতেন হাসির শুভ্র কিরণ ছড়িয়ে।

DO NOT COPY

শ্রীমা যে নিয়মে আসতেন সেই রকম এলেন রাত ১১টায়। শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দকে পানীয় দিতে উদ্যত হলে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন তিনি, এবং বাধ্য ছেলের মত একগ্লাস ফলের রস পান করেই বিশ্রামের কোলে আশ্রয় নিলেন।

বাড়তে লাগল উত্তরোত্তর উদ্বেলিত দুর্ভাবনা। হ্রাস পাবার কোনই লক্ষণ নেই। শ্রীমা আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, "আমি বুঝতে পারছি না কেন শ্রীঅরবিন্দের আর নিজের উপর আকর্ষণ নেই।"

আগামীকাল থেকে intravenous চিকিৎসা আরম্ভ করবার কথা বলাতেই শ্রীমা এই অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দকে বিরক্ত করতে নিষেধ করলেন।

পার হয়ে গেল সেই দীর্ঘ দুর্বিসহ রাত্রিটি। নীরদ ও চম্পকলালের সজাগ দৃষ্টি সর্বক্ষণ শ্রীঅরবিন্দের দিকে। ঠোঁট নড়ে উঠল একবার, মনে হল তিনি কিছু খেতে চাইছেন, হাত নড়ে উঠলে মনে হল তিনি রুমাল চাইছেন। সেবার জন্য সেখানে ছিলেন যাঁরা তাঁদের সাধনা গুরুদেবের অতন্দ্র সেবা, কারণ তাঁদের জীবন গুরুচরণে উৎসর্গীকৃত। মনে পড়ে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একদিন বলেছিলেন, তাঁর সাধনার সেই প্রথম দিনগুলির কথা - তিনি সমস্ত রাত্রি বসে কাটাতেন। চম্পকলাল তখন বালক মাত্র, নীচের সিঁড়ির পৈঠায় শুয়ে থাকত, কি জানি কখন গুরুর কি হুকুম হয়। একবার আমি বলেছিলাম যে প্রয়োজন হলে নীরদ ওষুধ বদলে দেবে। তিনি পরিহাস করেছিলেন-"নীরদ আমার ডাক্তারই নয়।"

মূত্রপ্রবাহের উপর আমাদের লক্ষ্য অবিচল, ২৪ ঘন্টার মধ্যে তার গতি ঠিকই ছিল। নীরদ বসে শ্রীঅরবিন্দের পাশে - কোন রকম অসুবিধা বা গোলমাল বুঝলে আমাকে খবর দেবে।

ডিসেম্বর ৪ঠা - ঊষাকালে তাঁর গায়ের উত্তাপ নেমে এল ৯৯ ডিগ্রীতে আর শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। মনে হল শ্রী অরবিন্দ উৎফুল্ল, সাড়া দিচ্ছিলেন আমাদের কথায়। প্রাতঃকৃত্যাদির শেষে প্রতিদিনকার মত আজও তাঁকে বসিয়ে দিলাম বিছানায়, শ্রী অরবিন্দ বসে আছেন - কি মহিমময় কি শান্ত স্থির মূর্তি! প্রায় ৯টার সময়ে শ্রীমা এসে তাঁকে কিছু প্রাতঃরাশ করালেন। পাশের ঘরে আমরা পরামর্শ করবার জন্য চলেছি - যেতে যেতে আমি শ্রীমায়ের দিকে চেয়ে হেসে বললাম, গুরুদেব যেন আবার আনন্দময় হয়ে উঠেছেন এবং বাইরের দিকে মনোযোগ দিতে পারছেন। শ্রীমা আমাকে নীরব হতে বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

DO NOT COPY

আমি বিছানার ধারে বসে গুরুদেবের দেহে হাত বুলিয়ে দিতে থাকি, নীরদ চম্পকলাল সেবার কাজে ব্যস্ত। একটু পরে শ্রীঅরবিন্দ তাকালেন দীর্ঘায়িত চক্ষু মেলে, তারপর তিনি জানতে চাইলেন কটা বেজেছে। আমি বললাম, দশটা।

মনে হল তিনি যেন কথা বলার জন্য আগ্রহী, তাই সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন বোধ করছেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "আরামে আছি।"

একটু নীরবতার পর তিনি একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তারপর প্রশ্ন করলেন, "বাংলাদেশের কি অবস্থা? বিশেষ করে বাস্তুহারাদের?" আমি তাদের দুরবস্থার বর্ণনা দিলাম এবং প্রার্থনা জানালাম, নিশ্চয়ই ভগবান তাদের সাহায্য করতে পারেন।

প্রত্যুত্তরে গুরুদেব শুধু বললেন, "হাঁ যদি বাংলা দেশ ভগবানকে চায়।" তারপর আবার চক্ষু মুদ্রিত করে সমাধিস্থ।

কিন্তু হায়, সে শুধুই ক্ষণিকের একটু বিরাম – আর মিথ্যা আশা। দুপুর থেকে বাড়তে বাড়তে ক্রমশঃ শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়ে উঠল গুরুতর। দেহের তাপ উঠল ১০২ ডিগ্রীতে। এই সময়ে মুখমণ্ডলেও প্রকট হয়ে উঠল ক্লেশের চিহ্ন। তবুও কথা নেই, প্রতিবাদ নেই।

প্রায় ১টার সময় শ্রীমা এলেন। কিছুক্ষণ শ্রীঅরবিন্দের দিকে তাকিয়ে রইলেন স্তব্ধভাবে। তারপর আস্তে আস্তে চললেন পাশের ঘরে আমাকে নিয়ে এবং বললেন, "তিনি চলে যাচ্ছেন।"

দৃশ্যতঃ তিনি অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছেন মনে হলেও যখনই তাঁকে কোন পানীয় দিতে যাওয়া হ'ত তিনি জেগে উঠতেন, কয়েক চুমুক পান করে রুমাল দিয়ে নিজের মুখখানা মুছে ফেলতেন। আমাদের সকলের বোধে এইটিই জাগ্রত হয়েছিল, যখন তাঁর অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক থাকত তখনই চেতনার আবির্ভাব হ'ত বাইরে থেকে, এবং শরীর জড়সড় হলে ও ক্লেশে অবসন্ন হয়ে পড়লে তাঁকে আর পাওয়া যেত না – তিনি কোথায় চলে গিয়েছেন।

বেলা ৫টার কাছাকাছি আবার তাঁর মধ্যে উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল। সকল বিষয়ে পূর্ণভাবে সাড়া দিচ্ছেন। তাঁকে বিছানার বাইরে নিয়ে এলাম – তিনি হেঁটে এসে বিশ্রামের জন্য আরাম কেদারায় আশ্রয় নিলেন। ক্ষণকালের

জন্য মনে হল তিনি ভিন্ন এক ব্যক্তি। তিনি বসে আছেন – নিমীলিত নেত্র, শান্ত, সমাহিত, অপার্থিব চেতনার দ্যুতি বিকীর্ণ করে – দেহের গঠনে কি মহিমময় সৌন্দর্য; সেই শান্ত, অপার্থিব মূর্তি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল বৈদিক ঋষিদের। কিন্তু হায়! এ জিনিস স্থায়ী হলনা বেশীক্ষণ। প্রায় এক ঘন্টা পর তাঁর মধ্যে ফুটে উঠল অস্থিরতার লক্ষণ। চাইলেন শয্যায় ফিরে যেতে। নিঃশ্বাসের কষ্ট দেখা দিল যেন দ্বিগুণ হয়ে। প্রস্রাবের যে গতি কয়েকদিন খুবই ভাল ছিল, দুপুরবেলা থেকে বিশেষভাবে তা কমে আসতে লাগল এবং ক্লেশ প্রবল হয়ে উঠল। যদিও মনে হল তিনি অচেতন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কারণ ওরই মধ্যে তিনি কয়েকবার চম্পকলালকে টেনে নিলেন কাছে, আলিঙ্গন করলেন এবং গভীর স্নেহে চুম্বন করলেন তাকে। শুধু তাকেই নয়, নীরদকে এবং আমাকেও সেই অপার্থিব অনুকম্পাভরা আলিঙ্গন দান করে ধন্য করলেন। এই প্রথম চোখে পড়লো তাঁর বাহ্যিক আচরণে এই গভীর হৃদয়াবেগ। অথচ সমস্তদিন তিনি এক বিন্দু জলস্পর্শ করেননি।

খেলার মাঠে নিত্যকার কার্যবিধি সাঙ্গ করে ফিরে এলেন শ্রীমা। প্রতিদিনকার মত আজও তিনি মালাখানি রাখলেন শ্রীঅরবিন্দের বিছানার ধারে। স্থির প্রেক্ষণে দেখতে লাগলেন শ্রীঅরবিন্দকে। শ্রীমার দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল আমার মন। সে বয়ানে এক অদ্ভুত নীরবতা, ও গাম্ভীর্য মণ্ডিত। আস্তে আস্তে বেরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে নীরবে শ্রীমায়ের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরে শ্রীমা এলেন।

আমি তাঁকে পূর্ণ বিবরণ দিয়ে জানাই, সত্য তাঁকে গ্লুকোজ দিয়েছে, এখন আমরা intravenous infusion ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা করি। তিনি স্থির, শান্ত ও অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, আমি তো বলেছি তার প্রয়োজন নেই। তিনি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন মর্ত্যকায়া থেকে।

শ্রীঅরবিন্দের বিছানার ধার ঘিরে বসলাম আমরা যাঁরা তাঁর সেবায় নিযুক্ত। মনের মধ্যে কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। কেন, কেন তাঁর নিজের প্রতি আর আকর্ষণ নেই? তিনি ইচ্ছা করলে, পূর্বে বহুবার যেমন করেছেন, এবারও তেমনি করে তো নিজেকে রোগমুক্ত করতে পারতেন। এমন তো নীরদ কত দেখেছে তিনি অন্যদের রোগমুক্ত করেছেন, কিন্তু এই এক সঙ্কট মুহূর্তে

নিজের সম্পর্কে কোন আকর্ষণই রাখলেন না। তিনি কি সত্যই আত্মত্যাগ করতে চলেছেন?

রাত এগারোটার সময়ে শ্রীমা এলেন। শ্রীঅরবিন্দকে আধ-কাপ টমেটোর রস পান করালেন, সে এক অপরূপ দৃশ্য! যে দেহ এতক্ষণ যন্ত্রণাহত, কথায় সাড়া নেই, নিঃশ্বাসের জন্য প্রাণপাত কষ্ট - সমস্ত যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেল। দেহে হল চেতনার অভ্যুদয়, শ্রীঅরবিন্দ হলেন সুপ্তোত্থিত, জাগ্রত, সুস্থ। তিনি রস পান শেষ করলেন। পরমুহূর্তেই তাঁর চেতনা কোথায় কোন শূন্যে মিলিয়ে গেল। দেহে সেই যন্ত্রণা প্রকট হল পুনর্বার।

অর্ধরাত্রে শ্রীমা আবার এসে প্রবেশ করলেন ঘরের ভিতরে। দৃষ্টিপাত করলেন গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে। মনে হল উভয়ে নীরবে তাঁদের চিন্তা বিনিময় করছেন। তারপরই তিনি চলে গেলেন।

ডিসেম্বর পাঁচ, রাত্রি একটা। শ্রীমা পুনরায় প্রবেশ করলেন। প্রভুর বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে স্থির প্রেক্ষণে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। শ্রীমার দিকে তাকাই, তাঁর মুখে নেই উদ্বেগ, নেই ক্লিষ্টতার লেশ, সর্ব ভয় ও অনুভব বর্জিত। সে মুখ যেন ব্যঞ্জনাহীন। চোখের ইশারায় শ্রীমা আমাকে পাশের ঘরে যাবার আদেশ করলেন। সেখানে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি বল, আমি কি ঘন্টাখানেকের জন্য নির্জনে অবস্থান করতে পারি?" এই মুহূর্তটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণঃ শ্রীমা নির্জন বাসে চলেছেন, চেতনা তাঁর দেহ ছেড়ে যাবে, কেউ তাঁর ঘরে তখন প্রবেশ করতে পারবে না, কেউ পারবে না তাঁকে ডাকতে। তাঁর এই আদেশ পালন করতেই হবে। আমি অস্ফুটকন্ঠে বললাম, "মাগো, এসব আমার মনের ধারণার বাইরে।" তিনি শুধু বললেন, - "সময় হলে আমাকে ডেকো।"

গুরুদেবের পিছনে দাঁড়িয়ে আমি আঙুল দিয়ে তাঁর কেশের মধ্যে চিরুণীর মত বুলিয়ে দিয়ে চলেছি। তিনি বরাবরই এতে আরাম পেতেন এবং পছন্দও করতেন। নীরদ ও চম্পকলাল বিছানার ধারে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। আমাদের সকলের অপলক দৃষ্টি তাঁর উপরেই ন্যস্ত। আর তো তখন আমাদের কারও কাছে অজানা ছিল না যে-কোন ঘটনা যে-কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে। শুধু অলৌকিক কিছুই বাঁচাতে পারে আমাদের ও পৃথিবীকে। এ সময়ে অতি ক্ষীণভাবে আমার প্রতীয়মান হল যেন তাঁর দেহ একটুখানি কেঁপে উঠল।

তিনি একবার হাত দুখানি তুললেন উপরে, তারপর বুকের উপর ন্যস্ত করলেন দুখানি হাতের অঙ্গুলিগুলি পরস্পরের মধ্যে জড়িয়ে – তারপর – তারপরই –স্তব্ধ হয়ে গেল সব।

মৃত্যু...নিষ্ঠুর মৃত্যু...বহুদিন ধরে অপেক্ষা করেছিল... আমরা আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার উপরে রেখেছিলাম, সে আজ আমাদের গুরুদেব, প্রভুর উপর নেমে এল। তাঁর শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ। নীরদকে বললাম শ্রীমাকে খবর দেবার জন্য। ঘড়িতে তখন রাত্রি একটা কুড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলেন শ্রীমা। শ্রীঅরবিন্দের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মাথার চুল অবিন্যস্ত, স্কন্ধময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এত অন্তর্ভেদী তাঁর দৃষ্টি যে সেদিকে তাকাতে পারছিলাম না।

শ্রীঅরবিন্দের স্পন্দনহীন কায়ার দিকে সেই দৃষ্টি মেলে শ্রীমা দাঁড়িয়ে। একটা ছাব্বিশ মিনিটে আমি পরীক্ষা করে দেখে জানাই সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

আর থাকতে পারল না চম্পকলাল, শ্রীমায়ের কাছে কেঁদে পড়ল, “মা, মা, তুমি বল ডাক্তার সান্যাল ঠিক কথা বলেনি। আমাদের প্রভু আমাদের ছেড়ে চলে যাননি।” শ্রীমা একবার তাকালেন চম্পকলালের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে যাদুমন্ত্র বলে শান্ত হয়ে গেল শোকে মুহ্যমান চম্পকলাল। আরও কিছুক্ষণ শ্রীমা সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার হাত তখনও শ্রীঅরবিন্দের কপালে ন্যস্ত। মহানির্বাণ হল আমার গুরুর – ঋষি শ্রীঅরবিন্দের – নব সৃষ্টির অগ্রদূত, নূতন ঊষার অবতার – শ্রীঅরবিন্দ এখন মর্ত্যের অতীত। কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও আশা করেছি ঘটবে, একটা অলৌকিক কিছু ঘটবে। শ্রীঅরবিন্দ আর নেই, তিনি ছিলেন, এখন তিনি ইতিহাসে। তড়িৎ বেগে আমার মস্তিষ্কে ঘুরতে লাগল কত সব চিন্তা। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম – হাজার হাজার লোক তাঁর বিছানার ধার দিয়ে যেতে যেতে অনুচ্চকণ্ঠে বলছে শ্রীঅরবিন্দ এইখানে থাকতেন। কিন্তু তা তো হতে পারে না, আমি তাঁর পাশে দঁড়িয়ে আছি, আমার হাত স্পর্শ করে আছে তাঁকে, আমি দেখতে পাচ্ছি তিনি নিঃশ্বাস ফেলছেন, হাঁ, প্রতিটি গতি – কিন্তু এখন সবই নিশ্চল – আমি ভাবতে পারি না আর! একটা শাণিত বেদনা ভেদ করে গেল আমার মস্তক। শ্রীমায়ের দিকে তাকাই। ধীরে ধীরে কাছে এসে তিনি স্পর্শ করলেন আমার শির, সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তা স্তব্ধ, মন শান্ত, বেদনা অন্তর্হিত – আবার আসে সহজ অবস্থা। শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমার কর্তব্য

কি এখন? এখন তো আমাদের অবশিষ্ট কাজগুলি সম্পন্ন করতে হবে।! তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "তাঁর সমাধি হবে "সার্ভিস" বৃক্ষের নীচে যেখানে বিশাল 'Maiden hair' গাছের চারাগুলি সাজিয়ে রাখা হয়েছে।" আগে থেকেই যে ঐ জায়গাটি চিহ্নিত হয়ে আছে, ভগবানের কাজ এমনই।

শ্রীমা আমাকে বলে দিলেন কি কি অনুষ্ঠান পালন করতে হবে। এখন একজন ফরাসী ডাক্তার মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেবেন। তারপরে কেবল আশ্রমবাসীদের ও সর্বসাধারণকে খবর দিতে হবে। ডাকা হল নলিনী গুপ্ত এবং অমৃতকে – তাঁরা এসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গুরুদেবের পায়ের কাছে পবিত্র – তাঁর দুই কপোল বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত।

আমরা গুরুদেবকে সাজানোর উদ্যোগ করতে লাগলাম। আমার অনুরোধে শ্রীমা রাজী হলেন আশ্রমের ফটোগ্রাফার (সাধক)-দের ডাকা হবে শেষ ছবি তুলবার জন্য।

হাসপাতালের ডাক্তার সুন্দরন এসে গুরুদেবের দেহ দেখলেন এবং তিনি আর আমি সই করলাম মৃত্যু-পরোয়ানায়।

এইবার আশ্রম সাধকদের খবর দেবার পালা। ঊষার উদয়ে পূর্বাকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে উঠছে, দিগ্‌বলয়ে দেখা দিল একটি আলোর শিখা। আমি প্রধান আশ্রম ত্যাগ করি নিঃশব্দে, অগোচরে।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গোলকুণ্ডায় আমার ঘরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখি – আশ্রমবাসীরা নীরবে ধাবমান আশ্রমের দিকে। শ্রীঅরবিন্দ বিদায় নিলেন – কি বেদনা, কি যন্ত্রণা আমার হৃদয় ভরে! আকাশের দিকে তাকাই – আহা, কি দেখছি, ঐ তো শ্রীঅরবিন্দ পুনরাবির্ভূত হয়েছেন – চিরন্তন সূর্য জ্বলে উঠেছেন কোটি আলোর জ্যোতিরেখা নিয়ে!

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের স্রোতও বাড়তে লাগল। চলেছে সব শান্ত স্থির চিত্তে মহান ঋষির শেষ দর্শনের জন্য। অপরাহ্নে আবার সেই ঘরে প্রবেশ করি যেখানে বিরাজ করছেন গুরুদেব এক প্রশান্ত রাজেশ্বর মূর্তিতে। অবিরাম জনস্রোত – সাধারণ থেকে যাজক, ডাক্তার, আইনজীবি, ধনী, নির্ধন নির্বিশেষে সবাই নীরব এক অনুপ্রেরণা নিয়ে মহান ঋষিকে পরিক্রমণ করে নিতে লাগল। গোধূলিতে আশ্রমের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেওয়া হল। শ্রীমা আমাকে আশীর্বাদ করে আসতে বললেন পরদিন প্রত্যুষে। চম্পকলাল এবং নীরদ নিযুক্ত রইল পর্যবেক্ষণে দিনরাত ধরে।

DO NOT COPY

ডিসেম্বর ছয়। প্রত্যুষের পূর্বেই আমি শ্রীঅরবিন্দের ঘরে প্রবেশ করি। শ্রীমা ও আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, কি অপূর্ব সে দৃশ্য। গুরুদেবের কায়া এক তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ধারণ করেছে। আমার ডাক্তারী বিদ্যায় অর্জিত মৃত্যুর কোন চিহ্ন মাত্র খুঁজে পেলাম না সেই দিব্য দেহে। একটু বিবর্ণ হওয়া বা দেহ নষ্ট হয়ে যাবার কোন লক্ষণ নেই। শ্রীমা চুপিচুপি বললেন, "অতিমানসিক আলো নিভে না যাওয়া পর্যন্ত শরীর নষ্ট হবার কোন লক্ষণ দেখা যাবে না। দু-একদিন অথবা আরও বেশী দিন এইভাবে থাকতে পারে।" আমি একান্তে বললাম, "আপনি বলছেন বটে, কিন্তু কোথায় সে আলো – আমি কি দেখতে পাই না?" আমি তখন শ্রীঅরবিন্দের বিছানার কাছে হাঁটু গেড়ে শ্রীমায়ের পায়ের কাছে বসেছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে অসীম অনুকম্পা মাখানো তাঁর হাতখানি আমার মাথায় রাখলেন। আর অমনি উদ্ভাসিত হল তাঁকে ঘিরে রয়েছে যে নীলাভ সোনালী আলোর আবরণ।

প্রভাত উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল জনস্রোত – চলেছে সারি বেঁধে, স্বর্গ-দেবতাকে শেষবারের মত দেখে নেবে। শ্রীমা আমাকে বললেন, "পৃথিবী জানল না কি চরম ত্যাগ স্বীকার করলেন তিনি তার জন্য। এক বৎসর পূর্বে নানা আলোচনা প্রসঙ্গে আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমি অনুভব করছি যেন আমার দেহ ছেড়ে যাবার সময় এসেছে। তিনি দৃঢ় স্বরে বলেছিলেন – না সে হতে পারে না। রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন হলে তিনিই চলে যাবেন কিন্তু অতিমানসের অবতরণ ও রূপান্তরের জন্য যোগ পূর্ণ করতে হবে আমাকেই।"

সেই রাত্রি পার হল। শ্রীঅরবিন্দের তিরোভাবের তৃতীয় দিন উপস্থিত। শ্রীমা এবং আমি তাঁর দেহ লক্ষ্য করলাম। তখনও দেহ বিকৃত হবার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। ফরাসী ডাক্তার আমাদের সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করলেন রাজ্যের নিয়মানুযায়ী।

শ্রীমায়ের ঘরে বসে আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলাম – আমার নিজের নির্বুদ্ধিতাই বলতে হবে – তাঁর ক্ষীণ শরীর নিয়ে তিনি অনেক পরিশ্রম করছেন তাই স্মরণ করিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করাতে তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে, "তুমি কি মনে কর যে আমার সকল শক্তিই নির্ভর করছে ঐ সামান্য আহারের উপর? নিশ্চয়ই না, দরকার হলে, সমগ্র বিশ্ব থেকেই অনন্ত শক্তি সংগ্রহ করা যায়।" তিনি আবার বললেন, "বর্তমানে আমার দেহ

ত্যাগ করার ইচ্ছে নেই। এখনও আমার অনেক কিছু করবার আছে। আমার দিক থেকে এটি আমার কাছে কিছুই না। আমি সব সময়েই শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে।"

শ্রীঅরবিন্দের হঠাৎ আত্মবিসর্জনের সিদ্ধান্ত আমাদের সকলকেই অন্তর থেকে নাড়া দিয়ে গেল। এ কি তাঁর পিছিয়ে যাওয়া? না, পৃথিবীর জন্য কোন কিছু অর্জন করবেন বলেই কি এই উপায় অবলম্বন? কে উত্তর দিতে পারে?

নিজেদের সীমিত মনের যুক্তি আশ্রয় করে আমরা যা-ই বলতে চেষ্টা করি না কেন, তা হবে আংশিক সত্য অথবা ব্যাত্যয়। আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন তাঁর উপর চরম বিশ্বাস রাখা কারণ অনেক যুদ্ধেই দেখা যায় আপাত পরাজয় হলেও শেষ বিজয় অনিবার্য। কোন সন্দেহ নেই, শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে আমাদের পার্থিব দৃষ্টির বাইরে নিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু শ্রীমা মহাশক্তি রূপে মানবের পক্ষ হয়ে অবিচলিত যুদ্ধ করে চলেছেন।

বিবাদে, অবিশ্বাসে, ঘৃণায় এবং লোভে বিধ্বস্ত পৃথিবী যখন হতাশায় নুয়ে পড়বার মত, সে মানবের উন্নতির, তার রূপান্তরের জন্য - বিধাতার নির্দেশের অপেক্ষা করে আকাশে তার কোন রেখা পড়েছে কিনা সেদিকে তাকিয়ে আছে- আর তখনই শ্রীমা মহা আশার বাণী সম্মুখে তুলে ধরেছেন।

৭ই সন্ধ্যায় আমি শ্রীমায়ের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করলাম। আবার শেষ দেখলাম গুরুদেবের আলোকোজ্জ্বল দেহ, ভগবান মরদেহে বিরাজমান- সুন্দর, শান্ত - তখনও দেহ অবিকৃত। আমি সরল ভাবে শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি আমার চিরাচরিত উপায়ে গুরুদেবকে চিকিৎসা করতে পারলাম না কেন, কেন তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হল আর কেনই বা ডেকে আনা হল আমাকে?"

শ্রীমা সান্ত্বনা দিয়ে আমাকে বললেন, "তোমাকেই আমরা সবাই এখানে চেয়েছিলাম - চিকিৎসা করবার জন্য নয়।"

শ্রীমা তিনবার আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আমার সকল দুঃখ নৈরাশ্য, সন্দেহ ঘুচে গেল, হৃদয় আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি নত হয়ে প্রণাম করলাম তাঁর চরণে এবং উঠে যখন দৃষ্টি ফেরালাম তাঁর দিকে, দেখলাম ভগবতী জননী, মহালক্ষ্মী আমার দিকে চেয়ে হাসছেন।

_____** ডঃ প্রভাত সান্যাল লিখিত "Call from Pondicherry"-র অনুবাদ, অনুবাদক শ্রীনিখিলকান্ত গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে।

এ কি! কি প্রসব হলো? ধাত্রীরূপিণী আশ্রিতা রমণী প্রসব করা থলিটার দিকে তাকিয়ে অবাক নয়নে উচ্চারণ করলো ঐ কথাটি। তার মুখ বিষণ্ণ, নয়নে বিস্ময়।

একটু পরেই সে ঐ প্রসব করা থলিটি তুলে নিয়ে চলে এলো বকুলতলায়। সেখানে ওটিকে কোলে দিয়ে সে ফিরে গেল প্রসূতি কমলাদেবীর কাছে।

ওদিকে পঞ্চবটীর কাছে বকুলগাছের নীচে থলিটি নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া লাগালো শিবার দল। তারা দাঁতে করে থলির মুখ ছিঁড়ে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল থলির মধ্যে শায়িত রয়েছে দুটি সুন্দর ও সুদর্শন শিশু। এই দুটি শিশুই উত্তরকালে পরিচিত হন রাম ও লক্ষ্মণ নামে।

ঐ সময় পঞ্চবটী বনে ধ্যানস্থ ছিলেন রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার। শিবাদলের চিৎকার শুনে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হলো। তিনি উঠে পড়লেন সাধন-আসন হতে। চলে এলেন বকুলতলায়। এসে দেখলেন সুন্দর দুটি শিশুকে। তখন তিনি তাড়াতাড়ি দুজঙ্কে কোলে তুলে চলে এলেন বাড়ীর মধ্যে।

বাড়ীর লোকজন নবজাতকদের দেখে মহা খুশী হলেন। পরবর্তীকালে রামঠাকুর বলতেন, জমকালো কোন নারী দ্বারা আমার নাড়ীচ্ছেদ হয়নি, হয়েছিল মাতৃরূপিণী শিবার দ্বারা।

ধাত্রী থলের মধ্যে নড়নচড়নশূন্য সদ্যোজাত শিশুকে দেখে ভেবেছিল মৃত জাতক হবে। তাই সে বকুলতলায় ফেলে এসেছিল।

রামঠাকুর আবির্ভূত হন ১২৬৬ সালের ২১শে মাঘ বৃহস্পতিবার রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত শুক্লা দশমীতে বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার ডিঙ্গামাণিক নামে গ্রামের রাঢ়ীর ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণবংশে। পিতার নাম রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার এবং মাতার নাম কমলাদেবী। এরা চার ভাই এবং এক বোন। দুভাই রাম ও লক্ষ্মণ এক সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন।

উপনয়নের সময় থেকেই রামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ন্যাসীর যোগাযোগ ঘটে। তারপর তিনি একসময় স্বপ্নযোগে দীক্ষালাভও করেন। পরে স্বপ্নে পাওয়া গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে তিনি সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকেন। আবার ওদিকে জাগতিক জীবনে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হলো না। স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো, কিন্তু পড়াশুনো হলো না। সংসারের অর্থাভাব লাঘবের জন্য

রামঠাকুর একাধিক জায়গায় পাচকের চাকরী নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করতে পারেন নি।

এভাবে জাগতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিমুখ হতে হতেও শেষকালে তিনি গুরু আনন্দস্বামীর কাছ থেকে অন্যতম মাতৃতীর্থ কামাখ্যাপীঠে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণ করার পর তান্ত্রিক সাধনায় প্রবেশ করেন। পরে ওখান থেকে গুরুদেবের সঙ্গে চলে আসেন মধ্যপ্রদেশের গভীর অরণ্যে। এখানে দীর্ঘকাল যাবৎ যোগ সাধনায় লিপ্ত হন রামঠাকুর। এই সময়কার কথা বলতে গিয়ে রামঠাকুর একবার তাঁর অন্তরঙ্গদের কাছে বলেছেন, আসনে বসিয়ে দেওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। গুরুদেবের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার মনে হলো এক রাত্রি মাত্র। কিন্তু জেগে দেখি আমার পরনে কাপড় নেই, নগ্ন দেহ, আমার মাথায় জটা হয়েছে, লম্বা দাড়ি হয়েছে, নখ বড় হয়ে গিয়েছে। আমি আসন থেকে উঠতে পারছি না। দূরে দাঁড়িয়ে গুরুদেব ডাকছেন। আমার সামনে যাবার খুব ইচ্ছে আছে কিন্তু ওঠবার শক্তি নেই। এই অবস্থা দেখে গুরুদেব আমাকে এসে সজোরে একটা লাথি দিলেন, ব্যথা পাইনি কিন্তু তখনও ভাল করে হাঁটতে পারিনি। আমাকে আরও কিছুদিন থাকতে বললেন।

কামাখ্যা ও মধ্যপ্রদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ তন্ত্র ও যোগ সাধনায় রত থাকার পর সিদ্ধিলাভ করলেন রামঠাকুর। এখন তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এবং পূর্ণ মাত্রায় যোগী। এবার গুরুদেব হিমালয়ের কয়েকজন যোগী পুরুষদের সান্নিধ্য লাভের জন্যে একদিন রামঠাকুরসহ দু'চারজন শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে চললেন হিমালয় অভিমুখে। ওখানে বেশ কিছুদিন যাবৎ যোগী সিদ্ধপুরুষদের সাধন-ভজন এবং অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম দেখা ও সেবাশুশ্রূষা করার পর তাঁদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিয়ে রামঠাকুর এবং তাঁর দু'চারজন গুরুভাই গুরুদেবের সঙ্গে ফিরে এলেন সমতলভূমিতে লোকালয়ের ভেতরে। উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা এবং লোক কল্যাণের জন্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে হিমালয়কন্দরে অবস্থান না করে লোকালয়ে অবস্থান করা।

দীর্ঘ প্রবাসজীবনের পর নিজের বাড়ীতে ফিরে এলেন রামঠাকুর। তাঁকে কাছে পেয়ে কমলাদেবীর মনে আনন্দ আর ধরে না। গ্রামের সকলে দেখতে এসেছে তাদের তাদের প্রিয় রামচন্দ্র তথা রামকে। কেউ উপদেশ দিচ্ছে আবার কেউ বা তিরস্কার করছে।

রামঠাকুর সব শুনছেন। কিন্তু কিছু বলছেন না। সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকছেন।

ওঁরা জানে না। সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ওদের সেই রাম আর রাম নেই। এখন সে রামঠাকুর। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। এখন তার ঋদ্ধি-সিদ্ধি করতলগত।

সিদ্ধ সাধককে বাহির থেকে কিছু বোঝা যায় না। তাকে দেখতে হয় অন্তর থেকে।

অন্তরে অন্তরে রামঠাকুর এত বিরাট, এত মহান হয়েছেন যে তার সঠিক পরিমাপ করবার, সঠিক মূল্যায়ণ করবার ক্ষমতা সাধারণের নেই।

সাধারণ মানুষ সাংসারিক বিষয় আশয় নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। তাদের মন আহার-নিদ্রা-মৈথুনে রত, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত। তাদের মন ক্ষণকালের জন্যেও ঈশ্বরমুখী হয় কিনা সন্দেহ। এ হেন মানুষের পক্ষে দিব্যপুরুষ-মহাসাধক রামঠাকুরের অন্তরদেশের ঠিকানা সংগ্রহ করা রীতিমত কঠিন কাজ বৈকি।

সাংসারিক অভাব অভিযোগ প্রতিকারের জন্যে, রামঠাকুর নোয়াখালিতে জনৈক ইঞ্জিনীয়ারের বাড়ীতে পাচকের কাজ নেন। তাই বলে তিনি সাধন ভজনে বিরতি দেন নি। তা' নিয়মমত এবং নিষ্ঠাভরে চলতে থাকে। এই প্রসঙ্গে রামঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র মহেন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেনঃ 'নোয়াখালির শহরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্মজীবন আরম্ভ হয়। এখানেই তিনি প্রথম যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে তিনি দিনকতক দেশে এসে স্বগৃহে বাস করেছিলেন। তৎকালে আমাদের বাড়ীতে একখানা খড়ের ঘরে তিনি অনেক সময় দরজা বন্ধ করে একাকী থাকতেন। ঐ ঘরে এত সময় একাকী কি করেন তা জানবার জন্য আমাদের কৌতূহল হত। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতাম, শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মাসনে বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন। সারাদেহ নিষ্পন্দ, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি রুদ্ধ। রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে নিবদ্ধ; গ্রীবাদেশ স্ফীত। কন্ঠ থেকে মধ্যে মধ্যে এক একটা বিকট স্বর নির্গত হচ্ছে। এ অবস্থায় ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যেত, আর তিনি ঐ অবস্থায়ই উপবিষ্ট থাকতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যতদিন দেশে ছিলেন একদিনও তাঁকে অন্ন গ্রহণ করতে দেখিনি। স্নান করার পর কোনদিন একটু বেলপাতা, কোনদিন হয়তো একটু বেলের কষ খেতেন। সময় সময় এক ফোঁটা ঘৃত জিহ্বায় দিতে দেখেছি। এরূপ একপ্রকার অনাহারে থাকলেও তাঁর দেহের ক্লান্তি পুষ্টি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি, শক্তির কোন অপচয় ঘটেনি। বরং উত্তরোত্তর তাঁর দেহ আরও সবল এবং উজ্জ্বল হয়েছিল।'

খাওয়া দাওয়ার দিকে মন থাকতো না রামঠাকুরের। তাঁর মন সদাসর্বদা যুক্ত থাকতো ঈশ্বরের ধ্যানে এবং মননে। মা কমলাদেবী ছেলেকে একবার

পীড়াপীড়ি করে দুধ খাইয়েছিলেন বলে রামঠাকুর বেশ কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পরে তিনি দুধ খাওয়া ছাড়লেন।

একবার ফেনিতে জেলখানার চাকরী নিলেন রামঠাকুর। ঐ সময় তিনি নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তির দ্বারা বহু লোকের উপকার করেন। ঘরে আহ্নিক করতে বসেছেন ঠাকুর। পর মুহূর্তেই তিনি আর সেখানে নেই। কোথায় যেন চলে গেছেন পরের মঙ্গল করতে।

পথচারীকে গরু মোষ তাড়া করেছে। তাই দেখে রামঠাকুর কেবল হাত তুললেন।

অমনি তারা থমকে দাঁড়াল। সাপ ছুটে এসেছে গর্জন করতে করতে। সামনে যাকে পাবে তাকে কাটবে। তাই দেখে রামঠাকুর হাতের আঙ্গুলেই ইশারা করলেন। অমনি সে নির্জীব ও শান্ত হয়ে গেল।

এত সব অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি নির্বিকার ও অহঙ্কারহীন থাকতেন। একসময় গুরুদেবের কথামত রামঠাকুর লোকালয় ছেড়ে চলে যান নিভৃত স্থানে সাধন ভজনের জন্যে।

এভাবে তিনি একটানা সতেরো বছর ধরে সাধন ভজন করেন, পরে ফিরে আসেন আবার লোকালয়ে লোক কল্যাণের জন্যে।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে রামঠাকুরের জননী কমলাদেবী দেহত্যাগ করেন। ঐ সময় রামঠাকুর কোলকাতার কালীঘাট নামে মহাতীর্থে অবস্থান করছিলেন। মাতৃ বিয়োগের সংবাদ শোনামাত্র তিনি শোকে মুহ্যমান হন।

এর কিছু দিন পর রামঠাকুরের বড় ভাই কালীকুমারও পরলোকে চলে যান। মায়ের মৃত্যুর পর রামঠাকুর তীর্থ পরিক্রমায় যান। এলেন দাক্ষিণাত্যের পথে। নানা স্থানে ঘোরার পর দেড় বছর পরে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিরে এলেন বাংলায়। কিছুদিনের জন্যে ডিঙামানিকে অবস্থান করেন। তারপর বাংলা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করে অসংখ্য ভক্ত ও অনুরাগীদের মধ্যে নিজের সাধনালব্ধ শক্তি ও কৃপা কণা বিতরণ করে তাদের সর্বপ্রকার মঙ্গল করেন। এই সময় তিনি হয়ে গেলেন অন্য এক মানুষ। 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গিরিগুহাবাসীর জীবন পরিত্যাগ করে জনকোলাহলের মাঝে অবস্থান করে সাধারণ পাপীতাপী সংসারীদের সঙ্গে মিশে থেকে তাদের মঙ্গল কামনা এবং মঙ্গল বিধানে তৎপর হলেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে কত ভাবের মানুষ কতরকম ভাবে যে উপকৃত হয়েছেন তা আর বলার কথা নয়। তিনি সকলকে দিয়ে যেতে লাগলেন নামামৃত। কলিকালে এই নামমন্ত্রই জীবের একমাত্র

উদ্ধারের পথ। সেই সঙ্গে তিনি কয়েকজন চিহ্নিত শিষ্যদের দিয়ে যান বীজমন্ত্র। তার দ্বারা তিনি তাদের যৌগিক ও তান্ত্রিক সাধনায় নিয়োজিত করেন।

কিন্তু সাধারণ মানুষদের জন্যে তিনি ঐ প্রকার কৃচ্ছ্রব্রত ও কঠোর তপ দুঃসাধ্য ভেবে নামমন্ত্র দিয়ে যান। সেই সঙ্গে প্রচলন করেন সত্যনারায়ণের সেবা অর্চনা। তিনি সরল ও সাধারণ মানুষকে আহ্বান করে বলতে থাকেন, তোমরা ঈশ্বরের নাম জপ করো। তাহলেই তোমরা উদ্ধার পাবে। সেখানে কোন জাত, কুলের বালাই নেই। যে কেউ এই নামমন্ত্রে দীক্ষা নিতে পারে।

একবার জনৈক শিষ্য রামঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন, লোকে জিজ্ঞেস করলে আমরা কোন সম্প্রদায়ের লোক বলবো?

উত্তরে রামঠাকুর হেসে বললেন, বলবে আমরা মানুষ সম্প্রদায়ের লোক। আমাদের কোন সম্প্রদায় নেই।

কলিকালের মানুষ অন্নগত প্রাণ। অন্নসংস্থানের ঝামেলায় তারা দিনরাত কর্মমুখর এবং ব্যতিব্যস্ত। তাদের জন্য সত্যযুগীয় কঠোর জপতপ বা কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজন নেই। ওপথে তাদের যাবার দরকার নেই। তাদের জন্যে প্রয়োজন নামধর্ম। নাম করলেই তারা সকলরকম আপদবিপদ হতে রক্ষা পাবে। এই নামমন্ত্র দিয়ে গেছেন রামঠাকুর জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য। তাঁর দিব্য প্রেমের কাছে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল সমান। তাই তিনি সকলের জন্য রেখে গেছেন পবিত্র নামধর্ম। পরম করুণাময় ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে তিনি যে রত্ন লাভ করেছিলেন তাই দিয়ে গেছেন জনসাধারণের জন্যে অকুন্ঠিত চিত্তে এবং অকৃপণ আবেগে। তাঁর এই মহান সর্বজনীন ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁরই ভক্ত ও শিষ্য প্রভাত চক্রবর্তী লিখেছেনঃ 'তিনি (রামঠাকুর) বলেন- নিত্যবস্তু বা স্বভাবের সঙ্গ না করিলে দুঃখের হাত হইতে এড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি একেবারে বিসর্জন করিতে না পারিলে শান্তি লাভ করা অসম্ভব। নিত্য বস্তু কি? যাহাকে কোন প্রকার ত্যাগ করা যায় না, তাহাই নিত্য। যাহাকে ধরিয়া থাকিলে পাপ তাপ দুঃখ যন্ত্রণা ভয়ে পালাইয়া যায়, তাহাই নিত্য। এই নিত্যের সেবা করাই ধর্ম। প্রাণ নিত্য, যেহেতু তাহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও থাকা চলে না। যে প্রাণ জগতের আশ্রয় এবং যাহার ক্রিয়া বা স্পন্দনের বিরাম নাই, সেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রাণদেবতার সঙ্গ করতে হয়। একটা কিছু আশ্রয় বা অবলম্বন না করিয়া সাধন ভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না। কাজেই যিনি সকলের আশ্রয়, সর্বভূতের প্রাণ এবং সর্বব্যাপক তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্যই বৈষ্ণবেরা বলেন- আশ্রয় লইয়া ভজে তারে

কৃষ্ণ নাহি ত্যজে। সর্বাশ্রয় ভগবানের কথা তিনি অনেক সময় বলিয়া থাকেন। এই আশ্রয়কেই উপনিষদে বলা হইয়াছে- সর্বলোক প্রতিষ্ঠা।'

কেবল নামমন্ত্র বিতরণ বা বীজমন্ত্রে দীক্ষাদান করেই ক্ষান্ত থাকেন নি রামঠাকুর। তিনি সকলের জন্যেই তাঁর দিব্যজীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি যে লোকপাবন, লোককল্যাণকৃৎ, ঈশ্বরের প্রতিভূ। তাই করুণাময় ঈশ্বরের মত অকৃপণ করুণা বিতরণের কাজে কখনো নিবৃত্ত হন নি। দীর্ঘকাল যাবৎ কঠোর সাধনভজনের ফলে তিনি যে দিব্য শক্তির অধিকারী হন তার দ্বারা নানারকম অলৌকিক উপায়ে বহু পাপী, তাপী, রোগী, জরাগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ এবং দুশ্চরিত্রদের ভবযন্ত্রনার দুঃসহ জ্বালা হতে অব্যাহতি দিয়েছেন। এমন কি এই প্রেমের ঠাকুর একবার পতিতালয়ে গিয়ে বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করেন। তাঁর অপার করুণার তুলনা নেই।

ভক্তদের সঙ্গে অনেক সময় ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ বা আধ্যাত্মিকতার বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন নিত্য সিদ্ধ ও উচ্চ কোটির সাধক রামঠাকুর। কখনো তিনি বলতেন, এই জগতে পর কেউ নেই। অহংকার বশেই আপন পর বলে মনে হয়।

আবার কখনো বলতেন, ভগবানের কৃপার লক্ষ্যে সর্বদা থাকুন। অন্ধকারে চলতে হলে একটা আলো নিয়ে চলাই কর্তব্য।

আবার কখনো বলতেন, নাম আর ভগবান একই পদার্থ। নাম সর্বদা হৃদয়ে জেগে থাকলেই নাম প্রতিষ্ঠা আর চৈতন্য হয়ে থাকে। নাম করতে করতে ভালই লাগুক আর মন্দই লাগুক নামেই উদ্ধার করে নেবে।

আবার কখনো বলতেন, (গ্রহরূপী জনার্দন) ভগবানের নাম করতে করতে গ্রহ-বৈগুণ্য সকল সহজ ভোগে কেটে যায়।

আবার কখনো গুরুমাহাত্ম্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, কোন চিন্তা নেই, গুরু সকল অভাব হতে নিষ্কণ্টকে উদ্ধার সাধন করবেন। এই গুরুর স্বভাব।

আহা কি সুন্দর কথা এটি। এই মহা উপদেশ বাক্যটি শুনলে মনে পড়ে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের অমর কথামৃত। তিনিও অর্জুনকে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেনঃ

'সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

আহা, কি সুন্দর আশ্বাস বাক্য। জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের এ হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম কথা। গুরুই শিষ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করে তাকে সর্বপ্রকার আপদ-বিপদ হতে রক্ষা করেন।

দ্বাপরে মহাগুরু শ্রীকৃষ্ণ যে কথা বলেছেন এবং যেরূপ কর্ম করে লোককল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন একালে রামঠাকুরও সদ্‌গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করে সংসারের বহু পাপী তাপী মানুষকে ভবসাগরে অতিক্রম করতে সাহায্য করেছেন।

সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখবার জন্য বাংলায় চারটি ও রাজস্থানের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করান রামঠাকুর। তাঁর প্রথম আশ্রমটি হলো চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে পাহাড়তলীতে। নাম শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম। দ্বিতীয়টি কোলকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে। এটিও শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম নামে খ্যাত। তৃতীয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছের পরম সাধক রামঠাকুরের জন্মস্থান ডিঙ্গামাণিকে। এটি শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ সেবামন্দির নামে প্রসিদ্ধ। চতুর্থ আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নোয়াখালী জেলার চৌমুহনীতে। এটি সমাধি আশ্রম নামে খ্যাত। পঞ্চম আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজপুতনার চিতোরে।

চট্টগ্রাম কৈবল্যধাম প্রসঙ্গে রাম ঠাকুর বেশ সুন্দর ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন। তিনি বলেছেনঃ চট্টগ্রাম কৈবল্য-ধামের চতুঃপার্শে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত স্থান সমস্তই কৈবল্যধামের অধীনে আসবে। যত খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, সকল শ্রেণীর সাধক এখানে এসে সাধনা করবে। কুম্ভমেলায় যেমন সাধু সন্ন্যাসীর সম্মিলন হয় তার চেয়ে বড় সম্মিলন এখানে হবে। এটি পৃথিবীর সমস্ত জাতির লোকের তীর্থস্থান হবে।'

শেষ বয়সে কয়েকদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন রামঠাকুর। তবু তারই মাঝে তিনি ভক্ত ও আশ্রিতদের কৃপা করে চলেছেন। কিন্তু শরীর আর স্থির থাকলো না। নশ্বর শরীরটা হচ্ছে নিছক মায়ার আবরণ। মুক্ত ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মহাসাধক রামঠাকুর এই আবরণ ছিন্ন করে ১৩৫৬ সালের ১৮ই বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ইহলোক ত্যাগ করে নিত্যধামে প্রস্থান করেন।

মামনুসর **সুনন্দন ঘোষ**

লিখতে লিখতে একদিন থেমে যাবে এই হাত,
লেখা তো চলবেই ...
চলতে চলতে একদিন থেমে যাবে দুটো পা,
পৃথিবী চলবেই।

পুরনো শরীরটাকে ফেলে রেখে হঠাৎ একদিন
নচিকেতার পথ বেয়ে পৌঁছে যাব কৃতান্ত-দুয়ারে।

ক্ষমাহীন অত্যাচারে কাতর যে পৃথিবী,
লোভ আর বাসনায় বিস্রস্ত যে পৃথিবী,
তার জন্য অঞ্জলি ভরে ছিনিয়ে আনব স্বর্গের আগুন,
বুকের মধ্যে তাকে জড়িয়ে নেব বাধাহীন উষ্ণতায়।

জন্ম থেকে জন্মান্তরে একাকী মানব
বিদ্রোহের মশাল নিয়ে হেঁটে যাব
অগ্নিশুদ্ধ ধরিত্রীর কাছে।

DO NOT COPY